৩.৫ তৃতীয় বিশ্বের অভ্যুদয় (Emergence of the Third World)

তৃতীয় বিশ্বের সংজ্ঞা ও পরিধি (Definition and dimension of the Third World)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে দ্বি-মেরুকৃত বিশ্ব ব্যবস্থায় বিশ্বরাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ঠান্ডা লড়াই-এর প্রকোপ বেড়ে চলার প্রেক্ষিতে Third World বা তৃতীয় বিশ্বের উদ্ভব ঘটেছিল। ১৯৫০-এর দশকে 'তৃতীয় বিশ্ব' অভিব্যক্তিটি ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সাধারণভাবে তৃতীয় বিশ্ব বলতে বোঝায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালীন সময়ে ঔপনিবেশিকতার অবসানের সাথে সাথে আত্মপ্রকাশ করা এশিয়া, আফ্রিকা, মধ্য ও লাতিন আমেরিকার সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলিকে। ১৯৭০ সাল নাগাদ তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে ছিল সমগ্র আফ্রিকার অধিকাংশ দেশসমূহ, চীন বাদে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ যেমন ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং সমগ্র লাতিন আমেরিকাসহ মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহ। এগুলো সবই পূর্বে পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির উপনিবেশ অথবা অধীন রাষ্ট্র ছিল এবং স্বাধীনতা অর্জনের সময় আর্থিক দিক থেকে এগুলি দুর্বল ও অনুন্নত ছিল। এইসব সদ্যস্বাধীন দেশগুলির একাধিক আর্থ-রাজনীতিক ও সামাজিক সমস্যা ছিল যেমন দারিদ্র্য, অপুষ্টি, অশিক্ষা, বেকারত্ব, অর্থনৈতিক পশ্চাদ্‌গামিতা, জনসংখ্যার মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি, নয়া উপনিবেশবাদের বিপদ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তাহীনতা, সামাজিক বৈষম্য তথা বর্ণবৈষম্যবাদ প্রভৃতি।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও পরিপ্রেক্ষিত একে অপরের থেকে পৃথক হওয়া সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও অন্যান্য প্রশ্নে তাদের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য ও সাধারণ বৈশিষ্ট্য বজায় ছিল। তৃতীয় দুনিয়াভুক্ত তিনটি মহাদেশের অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলি গোড়াতে অধিকাংশই ছিল দরিদ্র ও অনগ্রসর এবং বহুলাংশে অশিক্ষিত ও কর্মহীন জনগণের বাসভূমি। সর্বোপরি, সমস্যাজর্জরিত দেশগুলি সাধারণভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছতে নিজেদের মতো করে পথ খুঁজে নিয়েছিল। তারা পুরোপুরি পশ্চিমি উদারনৈতিক

Scanned with CamScanner

পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বরণ করে নেয়নি আবার অন্যদিকে কট্টর সাম্যবাদী-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে নির্ভরশীল হয়ে ওঠেনি। তারা পুঁজিবাদী প্রথম বিশ্ব ও সমাজবাদী দ্বিতীয় বিশ্ব থেকে সমদূরত্বের নীতি বজায় রেখেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য প্রথম বিশ্ব বা First World গঠিত ছিল আমেরিকার নেতৃত্বাধীন প্রধানত পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার শিল্পোন্নত সমৃদ্ধিশালী দেশগুলি নিয়ে যারা গণতন্ত্র, মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকার, পুঁজিবাদ এবং মুক্ত অর্থনীতি ও মুক্তবাণিজ্যে বিশ্বাসী ছিল। দ্বিতীয় বিশ্ব বা Second World-এর দেশগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাবাধীন পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ। তারা সাম্যবাদী প্রোলেতারীয় দল এবং আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অর্জনে বিশ্বাসী ছিল। এককথায়, এই দুই বিশ্বের বাইরের প্রায় সবদেশই ছিল তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত।

'তৃতীয় বিশ্ব' আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটি দুর্জ্ঞেয় বিষয় এবং একই সাথে একটি শিথিল ও দুর্বোধ্য ধারণা কেননা এটি কোনো একটি সুসংহত প্রতিষ্ঠান অথবা পরিকল্পিত রাষ্ট্র সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেনি। তাই তৃতীয় বিশ্বের সর্বজনমান্য কোনো সংজ্ঞা নিয়ে রাষ্ট্রচিন্তাবিদ ও বিশ্বরাজনীতির ভাষ্যকাররা ঐকমত্য পোষণ করেন না। কেউ কেউ তৃতীয় বিশ্ব সংক্রান্ত পূর্বোক্ত পশ্চিমি ধারণাটিকেই পুরোপুরি নস্যাৎ করে দিয়েছেন। শিবা নইপাল (S. Naipal) এ-প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'It is a flabby western concept lacking the flesh and blood of actual...a Third World does not exist as such'। 'তৃতীয় বিশ্ব' শব্দবন্ধ প্রথম ব্যবহার করেন রাষ্ট্রসংঘের প্রাক্তন মহাসচিব ডাগ হ্যামারশিল্ড (Dag Hammerskjold)। তিনি এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার দরিদ্র ও অনুন্নত রাষ্ট্রগুলিকে বোঝাতে 'তৃতীয় বিশ্ব' শব্দযুগল ব্যবহার করেছিলেন। ক্যালভোকোরেসি বলেছেন যে এটি তৃতীয় বিশ্ব ছিল কারণ এই সমস্ত তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলি মার্কিন ও সোভিয়েত নিয়ন্ত্রিত বিশ্বের দ্বিখণ্ডীকরণের ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়েছিল। মাও সে-তুং অবশ্য 'তৃতীয় বিশ্ব' সংজ্ঞাটিকে অন্তঃসারহীন বলেছিলেন। যাইহোক, গত শতাব্দীর সেই ষাটের দশকেই 'Third World countries rejected both Moscow's rigid communist dogmatism and Washington's increasingly rigid anti-communism.'

তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশই শুরু থেকে প্রকৃতিতে জোটনিরপেক্ষ দেশ। অবশ্য তৃতীয় বিশ্ব মানেই জোটনিরপেক্ষতা এরূপ অতিসরলীকরণ যথাযথ নয় কারণ, তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত বেশ কয়েকটি দেশ জোটনিরপেক্ষ বা non-aligned ছিল না। সেইজন্য তৃতীয় বিশ্বকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে না-দেখে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ

Scanned with CamScanner

থেকে দেখা অধিক যুক্তিসঙ্গত। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব যতটা শিল্পোন্নত ও আর্থিকভাবে মজবুত ছিল, তৃতীয় বিশ্ব ছিল ঠিক ততটাই দুর্বল ও পশ্চাৎপদ। বস্তুত, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি ছিল এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত দেশ, অর্থনীতির বিচারে যারা ছিল অনুন্নত অথবা উন্নয়নশীল। দু'একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে ঐসমস্ত দেশগুলির প্রায় সবকটিই জোটনিরপেক্ষ এবং দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত। ব্যতিক্রম হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সোভিয়েত গোষ্ঠীভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কয়েকটি দেশ যেমন আলবেনিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ও কিউবা তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল। অনুরূপভাবে ইউরোপের বাইরের কয়েকটি দেশ যারা কোনোদিনই ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে ছিল না তারাও তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত ছিল। বেশ কিছু সমধর্মীয় বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে তৃতীয় বিশ্বের সবকটি দেশ নির্বিচারে একই পংক্তিভুক্ত নয়। এই দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলেও উন্নয়নের মাত্রার ক্ষেত্রে তারতম্য লক্ষণীয়। মধ্যপ্রাচ্য, ভারত ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির ক্ষেত্রে আর্থিক উন্নয়নের হার অন্যদের থেকে বেশি এবং ক্রমবর্ধমান। এই ধরনের অন্তর্গত বৈপরীত্য নিয়েই তৃতীয় বিশ্ব গঠিত। এককথায়, তৃতীয় বিশ্ব ছিল 'দরিদ্র, অস্থিতিশীল, নবোদ্ভূত, অ-শ্বেতাঙ্গ এবং দুর্বল'। উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে ছিল সে।

তৃতীয় বিশ্বের প্রকৃতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং ভূমিকা (Nature, Goals, Objectives and Role of the Third World)

তৃতীয় বিশ্বের প্রকৃতি নিহিত আছে তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে। মূল বৈশিষ্ট্যগুলি নীচে আলোচিত হল।

সম্পদ ও আয়ের বিশ্বব্যাপী বৈষম্য

কেগলে ও উইটকফ[১৪]-এর মতে আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশেষজ্ঞরা সম্পদ ও আয়ের বিশ্বজোড়া অসাম্য ও বৈষম্যের নিরিখে তৃতীয় বিশ্বকে চিহ্নিত করেছেন। এঁদের বক্তব্যের মূল নির্যাস হল আবশ্যিকভাবে তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত দেশগুলি ছিল বিশ্বের মধ্যে দরিদ্রতর এবং অর্থনৈতিকভাবে কম উন্নত দেশ। এই বিভাজন এতটাই স্পষ্ট যে খুব সহজেই বলা সম্ভব কোন্‌টি উন্নত আর কোন্‌টি অনুন্নত বা উন্নয়নশীল। বিশ্বের জনসংখ্যার ৭৫ শতাংশ তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত। কিন্তু GNP (Gross National Product) অনুসারে এগুলি বিশ্বের মাত্র ২০ শতাংশ পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদনে সক্ষম। সমগ্র

---

১৪. Charles W. Kegley Jr. & E. R. Wittkopf, *op. cit.*, p. 23.

Scanned with CamScanner

তৃতীয় বিশ্বের গড় বার্ষিক আয় বা উপার্জন যেখানে ২০০০ ডলারেরও কম সেখানে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব তার বহুগুণ উপার্জন করে থাকে। বিশ্বের জনসংখ্যা ও সম্পদের বণ্টনে এই বৈষম্য মারাত্মকভাবে প্রকট। তাই দারিদ্র্য ও অনটন এই নতুন শতাব্দীতেও তৃতীয় বিশ্বের নিত্যসঙ্গী। তৃতীয় বিশ্বের মানুষজন প্রায়শই প্রোটিন ও ভিটামিনের ঘাটতির শিকার তাই তাদের মধ্যে হীনস্বাস্থ্য ও উচ্চ মৃত্যুহার বিসদৃশভাবে প্রকট।

পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদে বিভক্ত দুনিয়া থেকে সমদূরত্বের ধারণা

তৃতীয় বিশ্ব পুঁজিবাদী ও সাম্যবাদী দুনিয়া থেকে সাধারণভাবে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে অভ্যস্ত ছিল। তৃতীয় বিশ্ব নিজের অস্তিত্ব ও বিকাশের স্বার্থে আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীনে আড়াআড়িভাবে বিভক্ত দুনিয়ার ধারণাকে বর্জন করেছিল। তৃতীয় বিশ্ব দুই মহাশক্তির পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জিত সীমাহীন ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিতে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকত এবং তাই দুই সুপার পাওয়ারের প্রভাবাধীন পরস্পরবিরোধী সামরিক-রাজনৈতিক জোটের কোনোটিতেই সে অন্তর্ভুক্ত হতে চায়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে পুঁজিবাদ বনাম সমাজতন্ত্রের বিরোধ তথা পূর্ব-পশ্চিম সংঘাত থেকে সমদূরত্বের নীতি অর্থাৎ জোটনিরপেক্ষতার নীতি (Policy of non-alignment) গ্রহণ করেছিল এই রাষ্ট্রগুলি। এরা দুই মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের গূঢ় উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করত, হয়তো বা ঈর্ষাপরায়ণ ছিল তাদের অতুল সম্পদ ও বৈভবের প্রতি। উত্তেজনাপূর্ণ বিশ্বে গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের অন্তর্বর্তীস্থলে এক নিরপেক্ষ জীবনধারা তারা আবিষ্কার করেছিল।[১৫] এভাবে তৃতীয় দুনিয়াভুক্ত দেশগুলি সেদিন কমিউনিস্ট মতাদর্শ অথবা পুঁজিবাদী দুনিয়ার ক্রমবর্ধমান সমাজতন্ত্র বিরোধিতা—কোনোটিকেই আদর্শস্থানীয় বলে মেনে নিতে পারেনি।

উত্তর-দক্ষিণ বিরোধ (North-South Confrontation)

দুর্বল, অস্থির, নবগঠিত ও দারিদ্র্য কবলিত তৃতীয় বিশ্বের ধারণার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল আরও এক বিভাজন—উত্তর বনাম দক্ষিণ। এই বিভাজন নিহিত ছিল আর্থিক অবস্থা, ক্ষমতা ও সামর্থ্যের তারতম্যের মধ্যে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ (Edward Heath) (১৯৭০-৭৪) 'The Brandt Report' নামে পরিচিত একটি বিশেষ প্রতিবেদনে তৃতীয় বিশ্বের অবস্থা ও সমস্যাগুলি আলোচনা প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম জানান যে বিশ্ব আসলে দুটি অংশে বিভক্ত—উত্তর ও দক্ষিণ।[১৬] ঘটনাচক্রে অধিকাংশ ধনী ও উন্নত দেশগুলি

১৫. P. Calvocorressi, *op. cit.*, p. 94.
১৬. N. Lowe, *op. cit.*, p. 488.

Scanned with CamScanner

উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত এবং তৃতীয় বিশ্বের বেশিরভাগ দুর্বল ও দরিদ্র দেশসমূহের ভৌগোলিক অবস্থান হল দক্ষিণ গোলার্ধ। ধনী ও দরিদ্র বিশ্বের এই অর্থনৈতিক বিভাজনই কার্যত, 'উত্তর-দক্ষিণ বিভাজন'। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই কাল্পনিক বিভাজন রেখা পুরোপুরি রাষ্ট্রগুলির আর্থিক ক্ষমতা ও সঙ্গতির ওপর ভিত্তি করে টানা হয়েছে। মোটামুটিভাবে উত্তরের ধনী দেশগুলির মধ্যে ছিল শিল্পোন্নত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, প্রায় সমগ্র ইউরোপ, সোভিয়েত রাশিয়া, জাপান ও ব্যতিক্রমী হিসেবে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড। বিপরীত দিকে দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দক্ষিণি দেশগুলি ছিল এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার প্রায় সবকটি দেশ। ধনী ও দরিদ্র বিশ্বের মধ্যেকার এই বিভাজন এবং আলাদাভাবে ন্যায় ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার লক্ষ্যে তৃতীয় বিশ্বের সংগ্রাম আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে 'উত্তর-দক্ষিণ বিরোধ' নামে সুপরিচিত। পূর্ব-পশ্চিমের ঠান্ডা লড়াই-এর অবসান ঘটলেও উত্তর-দক্ষিণ বিরোধ এখনও অব্যাহত।

তৃতীয় বিশ্বের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (Objectives and Goals of the Third World)

শুরু থেকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি তিনটি সাধারণ উদ্দেশ্য ও একগুচ্ছ লক্ষ্য সামনে রেখে যাত্রা শুরু করেছিল। **প্রথমত,** ঐ দেশগুলি বিশ্বরাজনীতির আঙিনায় নিজেদের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান দৃঢ় করতে ঠান্ডা লড়াই ও দ্বি-মেরুতার রাজনীতি থেকে নিজেদের বিযুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত নেয় যা শেষ অবধি নির্জোট আন্দোলনের সূচনা করেছিল। **দ্বিতীয়ত,** তারা সমস্ত প্রকার ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ ও বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে লড়াই জারি রেখেছিল। **তৃতীয়ত,** আধুনিকীকরণ, শিল্প-বাণিজ্যের উন্নয়ন ও দ্রুত আর্থিক উন্নয়নের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্ব জন্মলগ্ন থেকে নিজেকে মেলে ধরতে প্রস্তুতি শুরু করে দেয়। তৃতীয় বিশ্বের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ ছিল নিম্নরূপ ঃ

ক. এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নসাধন। তৃতীয় দুনিয়ার রাজনীতিক ও রাষ্ট্রপ্রধানরা বুঝেছিলেন যে প্রযুক্তিগত নির্ভরতা (technological dependence)-র কারণে বিশ্ব উন্নয়নের সিঁড়ির শেষ ধাপে উন্নয়নশীল দেশগুলি নেমে গেছে।

খ. ১৯৭০-এর দশক থেকে তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত রাষ্ট্রসমূহ একটি নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক নীতি বা New International Economic Order (NIEO)-র দাবি উত্থাপন করে চলে। তাদের পরিকল্পিত সেই আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল পুঁজিবাদী বিশ্বের নয়া উপনিবেশবাদ-নির্দিষ্ট ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেগলে ও উইটকফ-এর মতে, 'Third World nations see the current system as an instrument of their continued oppression. They would like to be equal to the more advanced countries in the global community, in fact, not

just in law'।[১৭] প্রস্তাবিত নতুন আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থা বা NIEO-কে তৃতীয় বিশ্ব আসলে ধনী দেশগুলির স্বার্থে প্রচলিত শোষণমূলক ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিল।

গ. তৃতীয় বিশ্বের উত্থাপিত সাম্যের দাবি ক্রমে অর্থনীতি থেকে রাজনীতিতে প্রসারিত হয়। রিগিন্স[১৮] যথার্থই বলেছেন যে, তৃতীয় বিশ্বের অনেক বিশিষ্ট নেতা উন্নত বিশ্বের দ্বারা পৌনঃপুনিকভাবে অবহেলিত হতেন ও অবজ্ঞার পাত্রে পরিণত হতেন। তাঁরা আন্তর্জাতিক রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চে মতপ্রকাশের জন্য সচরাচর আমন্ত্রিত হতেন না, হলেও তাঁদের বক্তব্য সেভাবে গ্রাহ্য হত না। প্রতিটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র এই অবস্থার আমূল পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছিল। তারা নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে বাইরের হস্তক্ষেপের চরম বিরোধিতা করে। সমতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লক্ষ্যে তারা ছিল অবিচল। তৃতীয় বিশ্ব এভাবে প্রাপ্য সম্মান দাবি করেছিল।

ঘ. নিজেদের নবলব্ধ স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত রাখার প্রয়োজনে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তীকালে পূর্ব-পশ্চিমে বিভক্ত দুনিয়া থেকে সমদূরত্ব বজায় রাখতে তৎপর হয় এবং জোটনিরপেক্ষতার নিরাপদ বিদেশনীতি গ্রহণ করে। ঠান্ডা যুদ্ধের দিনগুলিতে একদিকে যেমন পরস্পরবিরোধী সামরিক জোটসমূহ আস্ফালন করে চলেছিল অপরদিকে তেমনি তৃতীয় দুনিয়ায় নির্জোট আন্দোলন বা Non-aligned Movement (NAM) দানা বেঁধে উঠেছিল। তৃতীয় বিশ্বের মোট ১২২টি দেশের মধ্যে ১০৩টি দেশ নিজেদেরকে নির্জোট বা জোটনিরপেক্ষ ঘোষণা করেছিল। এই বিষয়ে পরবর্তী অনুচ্ছেদে বিশদ আলোচনা করা হবে।

৩.৬ তৃতীয় বিশ্বের ওপর ঠান্ডা লড়াই-এর প্রভাব (Impact of Cold War on the Third World)

বিশ্বরাজনীতিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে অব-উপনিবেশীকরণজনিত তৃতীয় বিশ্বের অভ্যুদয় এবং ঠান্ডা লড়াই-এ সূচনা ও প্রসার একই সাথে সমান্তরালভাবে ঘটেছিল। ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে ঠান্ডা লড়াই ছিল দুটি মহাশক্তিধর দেশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন দুটি শক্তিজোটের মধ্যেকার মতাদর্শগত স্নায়ুর লড়াই বা অন্যভাবে বললে বিশ্বব্যাপী আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রথম বিশ্ব বনাম দ্বিতীয় বিশ্বের লড়াই। কিন্তু এই স্নায়ুযুদ্ধ প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব অর্থাৎ আমেরিকা ও ইউরোপের মাটিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তা দ্রুতগতিতে প্রসারিত

১৭. Kegley & Wittkopf, *op. cit.*, p. 94.
১৮. W. H. Wriggins, *Reducing Global Inequalities*, New York, 1978, pp. 19-117.

Scanned with CamScanner

হয়েছিল এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণমুক্ত সদ্যস্বাধীন দেশগুলি নিয়ে গঠিত তৃতীয় বিশ্বের বিস্তীর্ণ পরিমণ্ডলে। এই যুদ্ধোন্মাদনা নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল তৃতীয় দুনিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলিকে। বলা হয়ে থাকে, 'The Third World was both an observer and a pawn in the cold war'।[১৯] কখনও খোলাখুলিভাবে আবার কখনও পরোক্ষ চাপ তৈরি করে পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্রী উভয় জোটই ঠান্ডা যুদ্ধের দিনগুলিতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে নিজ নিজ শক্তি-বলয়ের মধ্যে টেনে আনতে সচেষ্ট ছিল। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত ছোটোমাপের রাষ্ট্রগুলি বিভিন্ন প্রক্রিয়ার পরিণতিতে ক্ষেত্রবিশেষে ঠান্ডা লড়াই-এর অংশীদার হয়ে উঠতে বাধ্য হয়েছিল। তারা দুই সুপার পাওয়ারের প্রয়োজনে নিজেদের ভূখণ্ডে সামরিক ঘাঁটি গড়ে তোলার অনুমতি দিয়েছিল। তারা অনেকেই তাদের ঋণদাতা বৃহৎ শক্তিগুলির অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছিল। পূর্ব-পশ্চিমের বিরোধে স্বেচ্ছায় জড়িয়ে পড়তে না চাইলেও যুদ্ধ-পরবর্তী অধিকাংশ সংঘর্ষই ঘটেছিল ঐসব দেশগুলিতে। কোরিয়ার যুদ্ধ, কিউবার মিসাইল সংকট, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যের আরব-ইজরায়েল সংঘর্ষ প্রভৃতি সংকটকে কেন্দ্র করে ঠান্ডা লড়াই-এ নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছিল যা তৃতীয় দুনিয়াকে বারেবারে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে চলেছিল।

মুদ্রার অপর পিঠটিও কম চিত্তাকর্ষক নয়। একদিকে ঠান্ডা লড়াই যেমন তৃতীয় বিশ্বের ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল তেমনি এর সুবাদে অন্যদিকে তৃতীয় বিশ্ব পরোক্ষভাবে অনেকটা সুসংহত রূপ ধারণ করেছিল। নিজেদের সদ্য পাওয়া স্বাধীনতাকে যে-কোনো মূল্যে রক্ষা করতে উন্নয়নশীল দেশগুলি বিবদমান দুই মহাশক্তির থেকে সমদূরত্বে থাকাকেই শ্রেষ্ঠ পন্থা বিবেচনা করেছিল। তারা সাধ্যমতো জোটনিরপেক্ষতার নিরাপদ ছাতার তলায় থেকে নিজেদের অস্তিত্বকে বিপন্মুক্ত রাখতে উদ্‌গ্রীব ছিল। এই সংহতিবোধ এক অর্থে ছিল ঠান্ডা যুদ্ধের পরোক্ষ অবদান। এই বৃহৎ ও জটিল প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তৃতীয় বিশ্বের গুরুত্ব অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিশ্ব রাজনীতিতে তৃতীয় বিশ্বের উপস্থিতি ও তার আন্তরিক প্রয়াস অনেক ক্ষেত্রে ঠান্ডা লড়াইজনিত উত্তেজনাময় ও সংঘাতপূর্ণ পরিবেশ থেকে বিশ্বকে মুক্ত করতে সাহায্য করেছিল। শান্তির বাতাবরণ তৈরির কাজে তৃতীয় বিশ্ব রাষ্ট্রসংঘকে সময়ে সময়ে সাহায্য করেছিল। ঠান্ডা লড়াই-এর অস্থির দিনগুলিতেও তৃতীয় বিশ্বের গঠনমূলক ও ইতিবাচক ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য। ভারতের মতো দেশ কোরিয়ার যুদ্ধের অবসানে, আরব-ইজরায়েল সংঘর্ষের প্রশমনে এবং বিভিন্ন সংকটে রাষ্ট্রসংঘের আহ্বানে সাড়া দিয়ে

---

১৯. V. K. Malhotra, *op. cit.*, p. 267.

Scanned with CamScanner

ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিল। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, 'The Third World Countries changed the nature and scope of international relations and made them global in true sense. They played a significant role in ending bipolarism, military alliances, cold war etc.'[২০] দ্বি-মেরুতা তথা ঠান্ডা লড়াই-এর অবসান, বলার অপেক্ষা রাখে না, তৃতীয় বিশ্বকে আরও কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

তৃতীয় বিশ্বের সমস্যাবলি (Problems of the Third World)

তৃতীয় বিশ্বের নিজস্ব সমস্যাগুলিকে তার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। তৃতীয় বিশ্বের কয়েকটি দেশ ব্যতিরেকে অধিকাংশ দেশেই স্বাধীনতা এসেছিল ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সংঘটিত রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। এর ফলে তাদের বহু মূল্য দিতে হয়েছিল ও স্বীকার করে নিতে হয়েছিল অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি। বহু প্রাণের বিনিময়ে বৈপ্লবিক সংগ্রামের পরিণতিতে কেনিয়া, মোজাম্বিক, অ্যাঙ্গোলা, আলজিরিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে স্বাধীনতা এসেছিল। এর সাথে যুক্ত ছিল তৃতীয় বিশ্বের স্বাধীন ও আধা-স্বাধীন কয়েকটি দেশে প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রতি-বিপ্লবী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জনগণের সশস্ত্র লড়াই। যেমন মধ্য আমেরিকায় কিউবা ও নিকারাগুয়াতে মার্কিন মদতপুষ্ট যথাক্রমে স্বৈরাচারী বাতিস্তা ও সোমোজো সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লবী জনগণকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামতে হয়েছিল। এর পাশাপাশি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ ও সংঘর্ষ এবং ধর্ম ও গোষ্ঠীকেন্দ্রিক লাগাতার অন্তর্ঘাত ও গৃহযুদ্ধ সেখানে শান্তি ও সুস্থিতি নষ্ট করে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে রীতিমতো বাধা সৃষ্টি করে চলে। ১৯৪৫ সাল থেকে এইসব দ্বন্দ্ব ও বিরোধের কারণে তৃতীয় বিশ্বের ২০ মিলিয়নের মতো মানুষ নিহত হয়েছিল।

তৃতীয় বিশ্বের সংকট বাড়িয়ে চলেছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মতো সুপার পাওয়ারের ক্ষমতা প্রদর্শন ও অনায্য হস্তক্ষেপ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে মার্কিন সামরিক ও কূটনৈতিক তৎপরতা ও অতি-সক্রিয়তা সময়ে সময়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। বিগত শতাব্দীর আশির দশক থেকে বিশ্বব্যাপী মার্কিন তৎপরতা ও নয়া উপনিবেশবাদ নতুন উদ্যমে প্রসারিত হতে থাকলে সংকটের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ঐ পর্বের কৌশলগত মার্কিন হস্তক্ষেপের নীতির উদ্ভাবক ছিলেন তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগন (১৯৮০) এবং সেই আধিপত্যবাদী মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি 'রেগন নীতি' (Reagon Doctrine) নামে পরিচিত ছিল। রেগনের 'Star War' বা নক্ষত্রযুদ্ধের প্রকল্পও তৃতীয় বিশ্ব জুড়ে আতঙ্কের আবহ তৈরি করেছিল।

---

২০. V. K. Malhotra, *op. cit.*, p. 358.

Scanned with CamScanner

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের পথে অবশ্য প্রধান বাধা ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও অর্থনৈতিক অধীনতা। কার্যত, আফ্রো-এশীয় দেশগুলি আর্থিক বিকাশের জন্য পশ্চিমি বিশ্বের ঋণ ও অনুদানের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে থাকত। ক্রমশ তারা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমি শক্তিগুলির নিয়ন্ত্রণাধীন বিশ্ব ব্যাংক (World Bank) ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (IMF)-এর মতো সংস্থার ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার পরিস্থিতি ছিল অতীব শোচনীয়। বৈদেশিক ঋণের ভারে ব্রাজিল-এর মতো দেশ একসময় ন্যুব্জ হয়ে পড়ে। ১৯৭৫-এ তার বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ যেখানে ছিল ৭৫ মিলিয়ন ডলার, ১৯৮৩-তে তা কয়েকগুণ বেড়ে ৩৪০ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছিল। এই ঋণ পরিশোধ করতে তৃতীয় বিশ্বের এই দেশটিকে তার রাষ্ট্রীয় আয়ের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ব্যয় করতে হত। পাশাপাশি ভারত ও নাইজিরিয়ার মতো পরিকল্পিত অর্থনীতি (Planned Economy)-র দেশেও পরিস্থিতি পুরোপুরি আশাব্যঞ্জক ছিল না।

পরিশেষ (Epilogue)

এইসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তৃতীয় বিশ্বের ভূমিকা ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছিল। রাজনৈতিক ভাষ্যকারদের মতে, 'আন্তর্জাতিক জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে তৃতীয় বিশ্ব ঠান্ডা যুদ্ধের উত্তেজনাপূর্ণ সময়ে বিশ্বরাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ সংকটগুলির সন্তোষজনক সমাধানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল এবং সেই সুবাদে সাফল্যের শরিক হয়েছিল।'[২১] অনেকে আবার একই পর্বে তৃতীয় বিশ্ব থেকে উদ্ভূত চতুর্থ বিশ্ব (Fourth World)-র উত্থানের দিকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। ক্যালভোকোরেসি-র মতো ঐতিহাসিকদের মতে 'ওপেক' (OPEC)-এর অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ পশ্চিম এশিয়ার অফুরন্ত তৈলসম্পদ সমৃদ্ধ ধনী আরব রাষ্ট্রগুলি নিয়ে গঠিত ছিল সেই চতুর্থ বিশ্ব। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে বিগত শতাব্দীর শেষ দিকে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রিত সমাজতান্ত্রিক শিবির বা তথাকথিত দ্বিতীয় বিশ্বের অবলুপ্তির পর 'তৃতীয় বিশ্ব' সংজ্ঞা ও অভিধাটি আক্ষরিকভাবে অর্থহীন হয়ে পড়েছে, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। এমত পরিস্থিতিতে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিকাশশীল দেশগুলির অন্য নামকরণ জরুরি হয়ে পড়েছে। তৃতীয় বিশ্ব আজ তৃতীয় নয়, শুধুই উন্নতিশীল বিশ্ব।

৩.৭ ঠান্ডা লড়াই-এর বিকল্প ঃ জোটনিরপেক্ষতার নীতি ও নির্জোট আন্দোলন (Alternative to the Cold War : Policy of Non-Alignment and the Non-Aligned Movement [NAM])

বিশ্বরাজনীতিতে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার নবজাত স্বাধীন দেশগুলির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল Non-alignment বা জোটনিরপেক্ষতার ধারণাকে

২১. D. C. Bhattacharyya, *op. cit.*, p. 374.

বাস্তবায়িত করে তোলা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালীন সময়ে যখন ঠান্ডা লড়াই-এর উত্তেজনা তুঙ্গে উঠেছিল এবং বিশ্ব দুটি বিবদমান শক্তিজোটে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল সেই সময় শান্তিকামী তৃতীয় বিশ্ব থেকে উঠে এসেছিল জোটনিরপেক্ষতার ধারণা। তৃতীয় বিশ্ব কার্যত, নিজের অস্তিত্বের স্বার্থে ঠান্ডা লড়াই-এর সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বিকল্প হিসেবে গড়ে তুলেছিল জোটনিরপেক্ষ বা নির্জোট আন্দোলনকে (Non-aligned Movement বা NAM)। ইতিপূর্বে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে যে বেশ কয়েকটি উন্নয়নশীল সদ্যস্বাধীন দেশ এই ধারণায় বিশ্বাসী ছিল যে দুটি যুযুধান শক্তিজোটের কোনো একটির পক্ষভুক্ত হলে তাদের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে। ঠান্ডা লড়াই-এ তাদের জড়িয়ে পড়ার অর্থ হল নিজেদেরই অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করা। এই প্রেক্ষিতেই জোটনিরপেক্ষতার সূচনা হয়েছিল। জোটনিরপেক্ষতার ধারণার পথপ্রদর্শক ও প্রথম পর্বের নেতৃস্থানীয়রা ছিলেন যথাক্রমে তৃতীয় বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ও ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান টিটো, মিশরের রাষ্ট্রপতি নাসের, ঘানার প্রেসিডেন্ট নক্রুমা, ইন্দোনেশিয়ার কর্ণধার সুকর্ন প্রমুখ। পরবর্তীকালে, নির্জোটের ধারণা এতটাই গতি ও জনপ্রিয়তা পেয়েছিল যে আগামী তিন দশকের মধ্যেই বিশ্বের অর্ধেকের বেশি দেশ এই বিষয়টিকে তাদের পররাষ্ট্রনীতির মূল প্রতিপাদ্য করে তুলেছিল। ক্রমশ নির্জোট আন্দোলন একটি তাৎপর্যবাহী বিশ্ব আন্দোলনের রূপ ধারণ করে ও বিভিন্ন দিক দিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রকৃতিকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়।

জোটনিরপেক্ষতার সংজ্ঞা ও অর্থ (Definition and meaning of the Non-alignment)

অধিকাংশ পশ্চিমি বিশেষজ্ঞরা জোটনিরপেক্ষতা বলতে বোঝান শুধুমাত্র নিরপেক্ষতা বা নিরপেক্ষতাবাদকে, যা যথার্থ নয়। জোটনিরপেক্ষতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে জে. ডব্লিউ. বার্টন (J. W. Burton) বলেছেন, জোটনিরপেক্ষতা বলতে বোঝায় সমাজতান্ত্রিক জোট ও ইঙ্গ-মার্কিন পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর প্রভাব থেকে দূরে সরে থেকে বিদেশনীতি নির্ধারণ ও পরিচালনা করা। পশ্চিমি ভাষ্যকাররা দুই শক্তিজোট থেকে সমদূরত্বের নীতি গ্রহণকে নির্জোট ব্যবস্থা বলে থাকেন। কিন্তু এই ধারণা বহুলাংশে অসম্পূর্ণ কারণ জোটনিরপেক্ষতার অর্থ মামুলি নিরপেক্ষতা অথবা শুধুমাত্র সমদূরত্ব পোষণ করা নয়, এর অর্থ ও পরিধি অনেক ব্যাপক ও বৃহত্তর। তৃতীয় দুনিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলির কাছে জোটনিরপেক্ষতা কোনো নেতিবাচক অথবা নিষ্ক্রিয় নীতি নয়। জোটনিরপেক্ষ দেশসমূহ আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ থেকে কখনও নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখতে অথবা দূরে রাখতে চায়নি, পরিবর্তে তাকে প্রভাবিত করতে সচেষ্ট ছিল। নির্জোট আন্দোলনের রূপকার ও প্রথম প্রবক্তা

Scanned with CamScanner

জওহরলাল নেহরু এর ইতিবাচক দিকটি বোঝাতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছিলেন যে জোটনিরপেক্ষতার অর্থ নির্লিপ্ততা নয়, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রয়োজনে যুদ্ধবাদী অশুভশক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করা। দুই বিশ্ব শক্তির দ্বারা চালিত ঠান্ডা লড়াই-এর বিরুদ্ধে তৃতীয় বিশ্বের প্রতিবাদ ঘোষিত হয়েছিল জোটনিরপেক্ষতার নীতির মাধ্যমে। জোটনিরপেক্ষতার একনিষ্ঠ অভিভাবককুল বিশ্বের অনুন্নত, ছোটো ও দুর্বল প্রকৃতির রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দায়বদ্ধ ছিল।

জোটনিরপেক্ষতার সূচনা (Initiation of Non-alignment)

জোটনিরপেক্ষ নীতির প্রথম ইঙ্গিত মিলেছিল নেহরুর উদ্যোগে ১৯৪৯ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্মেলনে যেখানে এশিয়ার সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলিকে নিয়ে একটি মঞ্চ গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়। ১৯৫৪ সালে শ্রীলঙ্কার কলম্বোয় আহূত আর একটি সম্মেলনে রাষ্ট্রসংঘের নিয়ন্ত্রণের বাইরে জোটনিরপেক্ষতা সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত হয়েছিল। ঐবছরের ২২ ডিসেম্বর নেহরু ও যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান মার্শাল টিটো দিল্লিতে নির্জোট নীতি বিষয়ক একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করেন। পরের বছর ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং-এ অনুষ্ঠিত একটি ঐতিহাসিক সম্মেলনে এশিয়া ও আফ্রিকার ২৬টি দেশের প্রতিনিধিরা মিলিত হন। ঐ সম্মেলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন নেহরু। ঐ সম্মেলনস্থল থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল এবং উপস্থিত রাষ্ট্রপ্রধানরা নির্জোট নীতিকে তাঁদের বিদেশনীতির প্রধান অভিমুখ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

বান্দুং সম্মেলনে গৃহীত নির্জোট নীতিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ঃ মানুষের মৌলিক অধিকার ও রাষ্ট্রসংঘের সনদে বিধৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, সকল রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকার ও ভৌমিক অখণ্ডতাকে স্বীকৃতিদান, অন্যদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, কোনো বৃহৎ শক্তির প্রতিরক্ষা বিষয়ক স্বার্থসিদ্ধি করা থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি। পরবর্তীকালে কায়রো-তে আহূত একটি সম্মেলনে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলির ২৫ জন রাষ্ট্রপ্রধানের উপস্থিতিতে জোটনিরপেক্ষতার মূল পাঁচটি নীতি ঘোষিত হয়েছিল। নীতিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল প্রতিটি জোটনিরপেক্ষ দেশ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও জোটনিরপেক্ষতা-নির্ভর স্বাধীন নীতি অনুসরণ করে চলবে, রাষ্ট্রগুলি অন্যান্য দেশের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করবে, কোনো সামরিক জোটের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না ইত্যাদি। এইসব নীতি ও কর্মপদ্ধতিকে সামনে রেখে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল এবং বিশ্বরাজনীতিতে এক নতুন যুগের অভ্যুদয় ঘটেছিল।

Scanned with CamScanner

জোটনিরপেক্ষতার বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Non-alignment)

জোটনিরপেক্ষতা ও তার থেকে শুরু হওয়া নির্জোট আন্দোলনের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. সামরিক জোটের বিরোধিতা ঃ নির্জোট দেশসমূহ NATO, SEATO, CENTO ও ওয়ারশ চুক্তির মতো সবধরনের সামরিক জোটের বিরোধী ছিল। তারা অস্ত্র প্রতিযোগিতার ইঁদুরদৌড়ে শামিল হয়নি। সামরিক জোট ও অস্ত্র প্রতিযোগিতাজনিত যুদ্ধ-উন্মাদনা জোটনিরপেক্ষ দেশগুলিকে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

২. ঠান্ডা লড়াই-এর বিরুদ্ধাচরণ ঃ নির্জোট আন্দোলন তাঁর সূচনালগ্ন থেকে ঠান্ডা লড়াই-এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল। জোটনিরপেক্ষ দেশগুলি আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন পরস্পরবিরোধী শক্তিজোটের মধ্যে চলতে থাকা ক্ষমতার দ্বন্দ্ব থেকে নিজেদের নিরাপদ দূরে সরিয়ে রাখতে সচেষ্ট ছিল। ঠান্ডা লড়াই-এর প্রশমনেও অনেকসময় তারা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

৩. মতাদর্শগত মেরুকরণের বিরোধিতা ঃ জোটনিরপেক্ষতা সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যেকার মতাদর্শগত মেরুকরণ ও বিভাজনে কোনোভাবে আস্থাশীল ছিল না। নির্জোট দেশগুলি মনে করত মতাদর্শগত কট্টর অবস্থান নমনীয়তার ঘোর শত্রু এবং শান্তির পরিপন্থী। ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের রাষ্ট্র জোটনিরপেক্ষতাকে গ্রহণ করেছিল ও NAM আন্দোলনে শামিল হয়েছিল।

৪. উন্নয়নের নিজস্ব পন্থা অবলম্বন ঃ নির্জোট দেশগুলি দুটি পরাক্রমশালী শক্তিজোটের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হুবহু গ্রহণ করতে রাজি ছিল না। তারা নিজেদের মতো করে অর্থনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজ গড়ার কাজে মনোনিবেশ করেছিল। এই প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে ও স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে তারা বদ্ধপরিকর ছিল। এই সূত্রে মিশ্র অর্থনীতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

৫. মিত্রতা ও সমতা ঃ জোটনিরপেক্ষতার অপর বৈশিষ্ট্য ছিল দেশে দেশে ও জাতিতে জাতিতে মিত্রতা ও সমতার ভিত্তিতে নতুন সম্পর্ক তৈরি করা। আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ব ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ওপর জোটনিরপেক্ষতা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল।

৬. রাষ্ট্রসংঘকে সমর্থন ঃ নির্জোট দেশসমূহ সর্বদা রাষ্ট্রসংঘকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করেছে ও শক্তিশালী হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে তারা বিশ্বশান্তি সুনিশ্চিত করার প্রয়োজনে রাষ্ট্রসংঘের নীতি ও কর্মসূচিকে সর্বতোভাবে সহায়তা জুগিয়ে এসেছে। এই আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংগঠনটিকে গণতান্ত্রিক করে তুলতেও তারা সচেষ্ট থেকেছে।

৭. জোটনিরপেক্ষতার অভ্যন্তরীণ জটিলতা ঃ একদল বিশ্লেষক এরূপ অভিযোগ করে থাকেন যে বেশ কিছু তথাকথিত জোটনিরপেক্ষ দেশের নিরপেক্ষতা নিয়ে সন্দেহ

Scanned with CamScanner

থেকে যায়। তাঁরা দেখিয়েছেন যে একাধিক জোটনিরপেক্ষ দেশ ঠান্ডা লড়াই-এর প্রেক্ষিতে কোনো কোনো শক্তিশালী রাষ্ট্রের সঙ্গে বিশেষ সামরিক অথবা কূটনৈতিক সম্পর্ক রেখে চলেছিল। এই অবস্থা জোটনিরপেক্ষতার মূলনীতির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ ছিল না। অন্যদিকে, আঞ্চলিকতাবাদ, ধর্মবিশ্বাস, মতাদর্শ, অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রভৃতির ওপর ভিত্তি করে নির্জোট আন্দোলনের ভিতরেই একাধিক গোষ্ঠী মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। নির্জোট গোষ্ঠীর বৈঠকে অথবা রাষ্ট্রসংঘের ঠান্ডা লড়াই ইস্যুতে আহূত সভাসমিতিতে ঐসব দেশগুলি নিজের নিজের পৃষ্ঠপোষক বৃহৎ শক্তিগুলিকেই সমর্থন করত। যেমন প্যালেস্টাইন প্রশ্নে প্রায় সব আরবদেশই একটি ভিন্ন জোটের অংশীদার ছিল। অবশ্য এর প্রত্যুত্তরে পাল্টা যুক্তি দেওয়া যায় যে জোটনিরপেক্ষতার অর্থ এই ছিল না যে এই নীতি মেনে নেওয়ার পর কোনো একটি দেশ দুই মহাশক্তিধর দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে পারবে না অথবা কোনো ইস্যুতে জোটের মধ্যে অন্য কোনো জোটের শরিক হতে পারবে না।

যাইহোক, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের অবদান এবং বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ওপর তার প্রভাব ছিল এককথায় যুগান্তকারী। বিশ্বশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার প্রশ্নে, ঠান্ডা যুদ্ধের ও দ্বি-মেরুতার রাজনীতির অবসানে, উপনিবেশবাদের উপসংহারে, জাতিবিদ্বেষ ও বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে, সামরিক জোট ব্যবস্থা ও অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণায় NAM বা নির্জোট আন্দোলন তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল এবং আজও পালন করে আসছে। দেশে দেশে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় রাষ্ট্রসংঘকে শক্তিশালী করে তোলার কাজেও 'ন্যাম'-এর ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

'ন্যাম' বা নির্জোট আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত (A brief history of NAM)

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে ১৯৫৫ সালে আহূত বান্দুং সম্মেলন থেকেই জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল। এরপর থেকে নিয়মিত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে নির্জোট আন্দোলন স্থায়ী মঞ্চ হিসেবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বিশ্বরাজনীতির আঙিনায় তার জায়গা করে নিয়েছে এবং জোটনিরপেক্ষ দেশের সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। NAM-এর প্রথম আনুষ্ঠানিক শিখর সম্মেলন বসেছিল যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড-এ। ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত লুসাকা সম্মেলনে বা গোষ্ঠী নিরপেক্ষ দেশের শীর্ষবৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে প্রতি তিন বছর অন্তর 'ন্যাম' দেশগুলির সম্মেলন আহূত হবে তৃতীয় বিশ্বেরই কোনো না কোনো দেশে।

Scanned with CamScanner

NAM-এর শিখর সম্মেলনসমূহ

স্থান	বছর	অংশগ্রহণকারী দেশের সংখ্যা
বান্দুং (ইন্দোনেশিয়া)	১৯৫৫	২৬
বেলগ্রেড (যুগোশ্লাভিয়া)	১৯৬১	২৫
কায়রো (মিশর)	১৯৬৪	৪৭
লুসাকা (জাম্বিয়া)	১৯৭০	৫৪
আলজিয়ার্স (আলজিরিয়া)	১৯৭৩	৭৬
কলম্বো (শ্রীলঙ্কা)	১৯৭৬	৮৬
হাভানা (কিউবা)	১৯৭৯	৯৪
দিল্লি (ভারত)	১৯৮৩	৯৯
হারারে (জিম্বাবোয়ে)	১৯৮৬	১০০
বেলগ্রেড (যুগোশ্লাভিয়া)	১৯৮৯	১০৩
জাকার্তা (ইন্দোনেশিয়া)	১৯৯২	১০৮
কার্টাজেনা (কলম্বিয়া)	১৯৯৫	১১৩
ডারবান (দক্ষিণ আফ্রিকা)	১৯৯৮	১১৩
কুয়ালালামপুর (মালয়েশিয়া)	২০০৩	১১৬
হাভানা (কিউবা)	২০০৬	১১৬
সার্ম আল শেখ (মিশর)	২০০৯	—

বিংশ শতাব্দীতে ৫০ ও ৬০-এর দশকে NAM-এর ভূমিকা

জাতীয়তাবাদের প্রাথমিক পর্বে নির্জোট আন্দোলনের প্রধান কাজ হয়ে উঠেছিল সামরিক জোটগুলির বিরোধিতা। এই সময়ে উপনিবেশবাদের ও বর্ণবৈষম্যবাদের অবসানেও নির্জোট দেশগুলি সক্রিয় ছিল। তারা সুপার পাওয়ারগুলির অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধের দাবি জানিয়েছিল এবং আঞ্চলিক সংঘর্ষের অবসানে রাষ্ট্রসংঘের প্রয়াসকে সর্বতোভাবে সমর্থন করেছিল। অল্প কথায়, ঠান্ডা লড়াই-এর বিকল্পের সন্ধান দিয়েছিল নির্জোট আন্দোলন।

৭০-এর দশকে NAM-এর ভূমিকা

এই দশকে ঠান্ডা লড়াই-এর কিছুটা প্রশমন ঘটে এবং দাঁতাত-এর রাজনীতির সূচনা হয়। অন্যদিকে নয়া উপনিবেশবাদের বিপদ ভয়াবহ চেহারা নিয়ে দেখা দেয়। ন্যাম এই পরিস্থিতিতে নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা (New International Economic Order বা NIEO)-র ডাক দেয়। ৭০-এর দশকের শেষদিকে দাঁতাত-এর অবসান ও নবপর্যায়ে ঠান্ডা লড়াই-এর সূচনা হয়। পরিণতিতে নির্জোট দেশগুলির কাজের পরিধিও

Scanned with CamScanner

বৃদ্ধি পায়। এই সময় থেকে 'ন্যাম' দেশগুলির প্রতিনিধিরা নিয়মিত আলাপ-আলোচনায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

৮০-র দশকে NAM

এই দশকে ইরাক-ইরান যুদ্ধ, আফগানিস্তান সংকট এবং কাম্পুচিয়ার সংঘর্ষের মতো আঞ্চলিক সংঘাতের অবসানে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। তারা এই পর্যায়ে অস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত দাবিগুলি উত্থাপন করেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় 'ন্যাম' বর্ণবৈষম্যবাদের অবসানের দাবি তুলেছিল। উত্তর-দক্ষিণ সম্পর্কের পাশাপাশি এই সময় দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার প্রয়োজন জোরদার হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনের প্রেক্ষিতে NAM তার সমস্ত শক্তি নিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছিল।

৯০-এর দশকে NAM-এর অবদান

বিগত শতাব্দীতে নব্বই-এর দশকে বিশ্ব পরিস্থিতির নাটকীয় পরিবর্তন হয়। সোভিয়েত রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতন ঘটে, সামরিক জোটবদ্ধতা অনেকটা প্রাসঙ্গিকতা হারায় এবং সর্বোপরি, ঠান্ডা লড়াই-এর অবসান হয়। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অনেকেই ধরে নিয়েছিল যে ঠান্ডা যুদ্ধ পরবর্তীকালীন দুনিয়ায় NAM তার প্রয়োজনীয়তা হারিয়ে পরিশেষে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু ১৯৯২-এ জাকার্তায় অনুষ্ঠিত নির্জোট আন্দোলনের শীর্ষবৈঠক সেই আশঙ্কাকে মিথ্যা প্রমাণ করেছিল। অবশ্য জোটনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর কর্মসূচিতে এর ফলে পরিবর্তন জরুরি হয়ে পড়েছিল। এই পর্বে গৃহীত কর্মসূচির মধ্যে ছিল উন্নত অর্থনৈতিক বিশ্বের সম্মিলিত জোটের বিরুদ্ধে উন্নয়নশীল বিশ্বের জোট মজবুত করা, পারমাণবিক অস্ত্র হ্রাস সংক্রান্ত আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। প্যালেস্টাইন প্রশ্নে ইজরায়েলের ভূমিকার সমালোচনা ন্যাম-এর পক্ষ থেকে তীব্রতর হয়ে উঠতে থাকে। সন্ত্রাসবাদের প্রসারেও NAM উদ্বেগ প্রকাশ করে।

নতুন সহস্রাব্দে NAM-এর ভূমিকা

নতুন সহস্রাব্দে NAM তার অস্তিত্ব ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে এবং তার কাজের পরিধিও বিস্তৃত হয়েছে। দ্বি-মেরু বিশ্বের অবসান ও এক-মেরু বিশ্বের নজিরবিহীন উত্থানের প্রেক্ষিতে মার্কিন একাধিপত্য প্রতিরোধ করার প্রয়োজনে ও তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ওপর আমেরিকার একের পর এক যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া ও রাষ্ট্রসংঘকে করতলগত করার অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি ক্রমে সরব হয়ে উঠছে। এর পাশাপাশি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO), আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (IMF), বিশ্বায়ন প্রভৃতির মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের ওপর আর্থিক শোষণ ও দুর্দশা চাপিয়ে দেওয়ার পশ্চিমি পুঁজিবাদী কৌশলের প্রতিও নির্জোট দেশগুলির প্রতিবাদ-প্রতিরোধ সাম্প্রতিক দিনগুলিতে ক্রমবর্ধমান।

Scanned with CamScanner

অতি সম্প্রতি ২০০৬ সালের ১৫-১৭ সেপ্টেম্বর 'ন্যাম'-এর চতুর্দশতম সম্মেলন সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। যাঁরা ঠান্ডা লড়াই-উত্তর দুনিয়ায় NAM-এর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তাঁরা জবাব পেয়ে গেলেন 'ন্যাম'-এর ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ঘোষণায় ঃ 'The 92 page NAM Political Declaration is a broad response to the unipolar hegemony of the U. S. It called for the defence of multilateralism and the principles of the U. N. Charter.' ঐ সম্মেলনে অসুস্থ ফিদেল কাস্ত্রোর ভাই ও সহকর্মী কিউবার কার্যকরী রাষ্ট্রপতি রাউল কাস্ত্রো দ্ব্যর্থহীনভাবে তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় 'ন্যাম'-এর যথার্থতা তুলে ধরেন ও ঐ সংগঠনের নীতিগুলিকে সুরক্ষিত রাখার আবেদন জানান। তিনি জানান, "শোষণ ও লুণ্ঠনের ওপর নির্ভরশীল" বর্তমান বিশ্বঅর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে জোটনিরপেক্ষতা সতত ক্রিয়াশীল। তাঁর মতে বিশ্বায়িত অর্থনীতি, বৃহৎ কর্পোরেশনগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাই এই বর্তমান দুনিয়ায় 'free trade' বা মুক্ত বাণিজ্য মরীচিকা ছাড়া কিছু নয়। হাভানা ঘোষণাপত্র বিশ্বজুড়ে সম্প্রসারিত সন্ত্রাসবাদের প্রতিও নির্জোট দেশগুলির জেহাদ চালিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিল। এখানে আরও বলা হয় যে যদিও গণতন্ত্র একটি সার্বজনীন ধারণা তথাপি সতর্ক থাকতে হবে কোনো একটি দেশ যেন এর দোহাই দিয়ে বাকি বিশ্বের স্বাধিকারকে হরণ না-করতে পারে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে তাঁর ইঙ্গিত ছিল প্রভুত্ববাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি। হাভানা শীর্ষবৈঠকে লেবাননের ওপর সম্প্রতিকালের ইজরায়েলি হানার তীব্র নিন্দা করা হয় এবং ইরান-আমেরিকা পরমাণু বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার ওপর জোর দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের বিষয়েও এখানে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং বলেন যে 'ন্যাম'-এর সহযোগিতামূলক কর্মপদ্ধতি, "clash of civilisations" বা 'সভ্যতার সংঘাতের মতো' উত্তর-আধুনিক পুঁজিবাদী ধারণাগুলিকে বাতিল করে দিয়েছে। তিনি রাষ্ট্রসংঘের পরিচালন ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণের ওপর জোর দেওয়ার কথাও বলেন।

পরিশেষে বলা যায় যে সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থার পতন ও বাজার অর্থনীতির ক্রমসম্প্রসারণ নির্জোট আন্দোলনের ওপর সবচেয়ে বেশি আঘাত হেনেছে সন্দেহ নেই, তবুও এই আন্দোলন তার প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি, তার মৃত্যু ঘটেনি। পরিবর্তিত পরিস্থিতির মোকাবিলায় সক্ষম হয়ে উঠলে জোটনিরপেক্ষতার অপরিহার্যতা আরও গভীরভাবে অনুভূত হবে। ২০১২ সালের NAM-এর শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে ইরানের রাজধানী তেহরান শহরে। ইরান-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সাম্প্রতিক সম্পর্কের প্রেক্ষিতে ওই নির্জোট সম্মেলন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে, মনে করা যেতে পারে।

Scanned with CamScanner